স্কয়ার

স্বাস্থ্য এবং ওষুধ বিষয়ক সাময়িকী

১৪ তম
বর্ষ ২০১২

- টাইফয়েড
- এ্যাজমা
- শিশুদের স্থুলতা
- রোগ প্রতিরোধে টিকা

ISSN 1682-0541

স্বাস্থ্য এবং ওষুধ বিষয়ক সামায়িকী
শুধুমাত্র স্বাস্থ্য নিবেদিত কর্মীদের জন্য প্রকাশিত

স্কয়ার
ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড
বাংলাদেশ

CERTIFIED ISO 9001 COMPANY

স্কয়ার

স্বাস্থ্য এবং ওষুধ বিষয়ক সাময়িকী

১৪তম বর্ষ, ২০১২

সূচী

টাইফয়েড	....	০১
এ্যাজমা	....	০৪
শিশুদের স্থূলতা	....	০৭
রোগ প্রতিরোধে টিকা	....	০৯
কয়েকটি ওষুধের ব্যবহার ও বিধিনিষেধ	....	১২

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ,

বাংলা 'স্কয়ার' এর ২০১২ সালের সংখ্যাটি আপনাদের হাতে পৌছে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এ সংখ্যায় বহুল আলোচিত 'টাইফয়েড' সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া 'এ্যাজমা', 'শিশুদের স্থূলতা' এবং 'রোগ প্রতিরোধে টিকা' প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। সেই সংঙ্গে আমাদের নিয়মিত বিভাগে কয়েকটি ওষুধের ব্যবহার ও বিধিনিষেধ প্রকাশিত হল।

প্রতিবারের মত বর্তমান সংখ্যাটিও আপনাদের সবার ভাল লাগবে এবং কাজে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আপনাদের সুচিন্তিত মতামত জানালে খুশি হব। আপনাদের মতামত আমাদের বাংলা 'স্কয়ার' এর উত্তরোত্তর উন্নতিতে সহায়তা করবে ।

সবশেষে 'স্কয়ার' পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের এবং আপনাদের পরিবারের সকলের সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করছি।

শুভেচ্ছাসহ

ডাঃ ওমর আকরাম-উর রব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

ডাঃ ওমর আকরাম-উর রব

এমবিবিএস, এফসিজিপি
এফআইএজিপি
পোঃ গ্রাঃ ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (ইন্ডিয়া)

নির্বাহী সম্পাদক

ডাঃ মোঃ মাহফুজুর রহমান সিকদার

এমবিবিএস, এমবিএ

বিশেষ সহযোগিতায়

ডাঃ এ এস এম শওকত আলী

এমবিবিএস, এম. ফিল

ডাঃ রেজাউল হাসান খান

এমবিবিএস, এমপিএইচ, এমবিএ

প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ISSN 1682-0541
Key title : Skayara

টাইফয়েড

টাইফয়েড রোগের নামের সাথে বাংলাদেশের মানুষ কম বেশি সবাই পরিচিত। বাংলাদেশের জীবনযাত্রার মান তেমন স্বাস্থকর নয়। তাই এখানে টাইফয়েডের রোগজীবাণু সহজেই সংক্রমিত হয়। সারা বিশ্বে বছরে টাইফয়েডে প্রায় ৩ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয় এবং প্রায় ৭ লক্ষ মানুষ মারা যায়। স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে আমাদের দেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশে প্রতি বছর গড়ে ১ হজার জনের মধ্যে ৪ জন টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়। আর ৫ বছর বয়সের নিচের শিশুদের মধ্যে প্রতি বছর গড়ে ১ হাজার জনের মধ্যে ১৯ জন টাইফয়েডে ভোগে। অর্থাৎ অন্যান্য অনেক রোগের মতো টাইফয়েডের হুমকিও শিশুদের জন্যই বেশি। উন্নত বিশ্বে যথাযথ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার কারণে তারা প্রায় টাইফয়েডমুক্ত।

জন্মের পর থেকেই শিশুদের এরোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা দেওয়া হয় এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অনেক উন্নত।

টাইফয়েড এবং এর ইতিহাস

টাইফয়েড জ্বর একটি তীব্র জ্বর যা সালমোনেলা টাইফি ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়। সালমোনেলা প্যারা-টাইফি ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সাধারণত কম গুরুতর অসুস্থতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়া পানি অথবা খাদ্য দ্বারা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। টাইফয়েড জ্বর উন্নত দেশে বিরল কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে তীব্র স্বাস্থ্য সমস্যা হতে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টাইফয়েড জ্বর ১৯০০ সালের প্রথমার্ধ থেকে লক্ষণীয়ভাবে কমে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং মিশর ইত্যাদি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উচ্চ ঝুঁকি এলাকা হিসেবে

বিশ্বব্যাপী টাইফয়েড এর বিস্তার

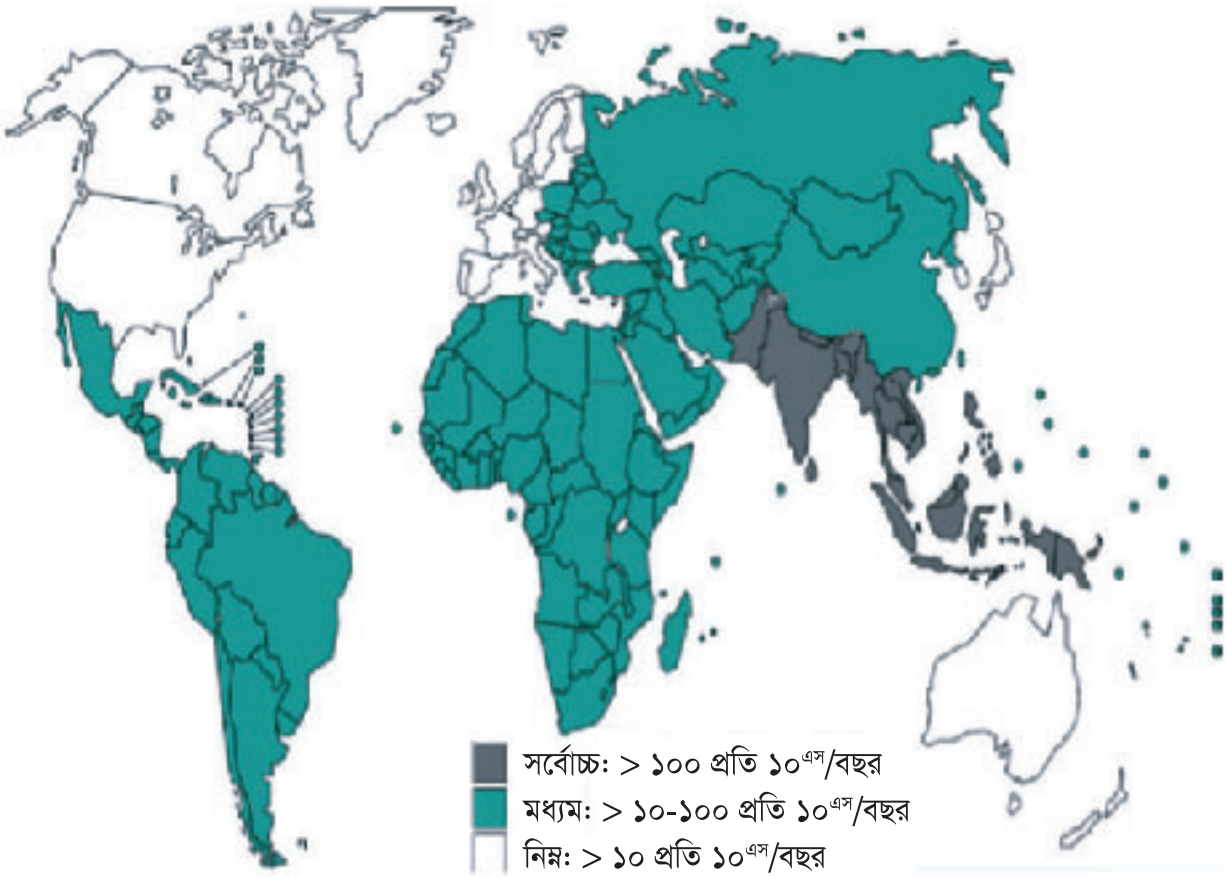

টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া জনিত একটি রোগ। বিশ্বজুড়ে এর বিস্তার দেখা যায়। *সালমোনেলা টাইফি/প্যারা-টাইফি (Salmonella typhi/Para typhi)* ব্যাকটেরিয়া দ্বারা রোগটির সৃষ্টি হয়। দূষিত খাবার বা পানির মাধ্যমে রোগটি সংক্রমিত হয়।

টাইফয়েড জ্বর উন্নত দেশে এখন অনেক কম দেখা যায়। কারণ সেখানে পরিচিতি লাভ করেছে।

যেভাবে হয়

টাইফয়েডের জীবাণু দূষিত পানি ও দূষিত খাবারের মাধ্যমে ছড়ায়। মাছি এই রোগবিস্তারে বেশি দায়ী। শুষ্ক মৌসুমে পানি দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে কিংবা বর্ষা মৌসুমে পানিবাহিত রোগের বিস্তারের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

তাই এ দুই মৌসুমেই এই রোগ বেশি হয়। টাইফয়েড মূলত পরিপাকতন্ত্রের রোগ। কোনো জ্বরই নিজে কোনো রোগ নয়, বরং অন্য কোন রোগের উপসর্গ হিসেবে শরীরে জ্বর আসে। এ রোগের জীবাণু দ্বারা পরিপাকতন্ত্র সংক্রমিত হয়। আর এ কারণেই জ্বর হয়। টাইফয়েড জ্বর ব্যাকটেরিয়া যুক্ত দূষিত খাবার বা পানি দ্বারা সংক্রমিত হয়। তীব্র অসুস্থ রোগীদের মলের (যাতে ব্যাকটেরিয়ার উচ্চ ঘনত্ব রয়েছে) মাধ্যমে পানি সরবরাহ দূষিত হতে পারে। এই দূষিত পানির মাধ্যমে পরবর্তীতে রোগটি ছড়ায়। প্রায় ৩%-৫% তীব্র অসুস্থ রোগী পরে ব্যাকটেরিয়ার বাহক হয়ে যায়। এই রোগীরা ব্যাকটেরিয়ার দীর্ঘমেয়াদী বাহক হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া গলব্লাডার, পিত্ত থলি অথবা যকৃতে অবস্থান নেয়। দীর্ঘস্থায়ী বাহকের কোন লক্ষণ দেখা যায় না এবং পরবর্তীতে জ্বর নতুন করে শুরু হতে পারে।

টাইফয়েড জ্বর কিভাবে ছড়ায়

টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি স্যালমোনেলা টাইফি ব্যাকটেরিয়া বহন করে। এছাড়াও টাইফয়েড জ্বর হতে আরোগ্য লাভ করেছেন কিন্তু এই ব্যাকটেরিয়া বহন করছেন এমন কিছু সংখ্যক ব্যক্তিও এই রোগের বাহক হতে পারে।

টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং স্যালমোনেলা টাইফি ব্যাকটেরিয়া বহনকারী উভয় ধরনের ব্যক্তিরাই মলত্যাগের মাধ্যমে এই ব্যাকটেরিয়ার বিস্তার ঘটিয়ে থাকে।

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা যথাযথ না হলে এবং তার ফলে টাইফয়েড রোগীর মলত্যাগের পর এই ব্যাকটেরিয়া পানির সংস্পর্শে আসলে এবং পরবর্তীতে এই দূষিত পানি খাবারে ব্যবহৃত হলে অথবা টাইফয়েড জ্বরের ব্যাকটেরিয়া বহন করছে এমন কোন ব্যক্তির স্পর্শকৃত বা হাতে বানানো খাবার গ্রহণ থেকেও টাইফয়েড জ্বর সংক্রমিত হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

টাইফয়েডে রক্তের সাধারণ পরীক্ষা করতে হবে। প্রথম সপ্তাহে রক্ত কালচার করলে জীবাণু পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য রক্তের কালচারে প্রথম সপ্তাহের পরও জীবাণু পাওয়া যায়। বহুল প্রচলিত ভিডাল টেস্টের মাধ্যমে দ্বিতীয় সপ্তাহে জীবাণুর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। তবে এই পরীক্ষার ফলাফলে যথেষ্ট সংশয়ের বিষয় রয়েছে। তৃতীয় সপ্তাহ থেকে পায়খানা কালচারেও জীবাণু পাওয়া যেতে পারে।

চিকিৎসার জন্য শরীরে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স (Resistance) আছে কি-না তা পরীক্ষা করা উচিত। এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স থাকলে শরীরে কোনো কোনো ওষুধ কারো কারো ওপর কোনো কাজ করবে না। ২০০১ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৫০ ভাগের কম ক্ষেত্রে এম্পিসিলিন, কোট্রাইমেক্সাজল, ক্লোরামফেনিকল ইত্যাদি কাজ করেছে, ৯৮ ভাগের ক্ষেত্রে সেফট্রায়োক্সোন কাজ করেছে এবং সবক্ষেত্রেই সিপ্রোফ্লোক্সাসিন কাজ করেছে।

বিভিন্ন ওষুধে রেজিস্ট্যান্টদের ক্ষেত্রে সেফট্রায়োক্সোন ব্যবহার করা যায়। রোগের মেয়াদ দীর্ঘ হলে বা রোগী খুবই কাতর হলে স্টেরয়েড দেওয়া যেতে পারে।

রোগ নির্ণয়ের জন্য মল বা রক্তের ল্যাবরেটরী পরীক্ষা (Culture) এর মাধ্যমে টাইফয়েড জীবাণু চিহ্নিত করা হয়। জ্বর একসপ্তাহ হওয়ার পর Widal Test নামক রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেও টাইফয়েড রোগ নির্ণয় করা যায় ।

সালমোনেলা টাইফি

টাইফয়েডের লক্ষণ

টাইফয়েড রোগের সূচনাটা একটু কপট ধরনের, অর্থাৎ আক্রান্ত হওয়ার পরেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত স্পষ্ট কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। রোগ শুরুর দিকে চাপা অস্বস্তি, মাথা ব্যথা, ঝিমঝিম করা, শরীর ব্যথা ইত্যাদি অনুভূত হয়। সাধারণত জ্বর একটু বাড়ে, পরে আবার একটু কমে। এভাবে ক্রমাগত বাড়া-কমার মাধমেও মোটামুটি একটা সীমার মধ্যে থাকে। তৃতীয় সপ্তাহে বাড়া-কমার মাধ্যমে জ্বর কমতে থাকে। ডায়রিয়া বা বমি হতে পারে। কখনো কোষ্ঠকাঠিন্যও হতে পারে। পেট ফেঁপে ওঠে, কাশি হয়, প্লীহা বড় হতে পারে। পেটের ওপরের দিকে বা পিঠে লালচে দাগ হতে পারে বা একটু চাপ দিলে হালকা হয়ে যায়। রোগী প্রলাপ বকতে পারে, এমনকি অচেতনও হতে পারে। সাধারণ লক্ষণগুলো হল-

- সময়ের সাথে সাথে জ্বর তীব্র হতে থাকে।
- ক্ষুধা মন্দা।
- পেটে ব্যাথা।
- মাথাব্যাথা।
- গায়ে ব্যাথা এবং যন্ত্রণা।
- জ্বর, প্রায়ই ১০৪ ডিগ্রী ফারেনাইট পর্যন্ত হয়।
- দুর্বলতা (সাধারণত যদি চিকিৎসা না করা হয়)।
- অভ্যন্তরীণ রক্তপাত বা অন্ত্র ছিদ্র হয়ে যাওয়া (রোগের দুই থেকে তিন সপ্তাহ পর)।
- পাতলা পায়খানা বা কোষ্ঠবদ্ধতা।

চিকিৎসা

টাইফয়েড জ্বরের জন্য এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। শুরুতেই রোগটির সঠিক চিকিৎসা না হলে এই রোগ থেকে নিউমোনিয়া, আন্ত্রিক রক্তপাত বা অন্ত্রের ছিদ্র থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে। এন্টিবায়োটিক এবং সহায়ক যত্ন দিয়ে ১%-২% মৃত্যুহার কমানো যায়। উপযুক্ত এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে রোগের উন্নতি সাধন সম্ভব।

বিভিন্ন এন্টিবায়োটিক টাইফয়েড জ্বর চিকিৎসার জন্য কার্যকর। ক্লোরামফেনিকল (Chloramphenicol) বহু বছর ধরে পছন্দের ড্রাগ ছিল। গুরুতর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হওয়ায় ক্লোরামফেনিকল (Chloramphenicol) অন্যান্য কার্যকর এন্টিবায়োটিক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। Ciprofloxacin হল সবচেয়ে ঘন ঘন ব্যবহৃত ওষুধ। গর্ভধারন করেননি এমন রোগীদের জন্য সেফট্রায়োক্সোন (Ceftriaxone) এবং গর্ভবতী রোগীদের জন্য বিকল্প ওষুধ এ্যমপিসিলিন (Ampicillin) দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। টাইফয়েড বহনকারী রোগীদের দীর্ঘ মেয়াদী এন্টিবায়োটিক দিতে হয়।

টিকা

বর্তমানে এই রোগের টিকা পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, শিশুর এক বছর বয়সের মধ্যে টিকা দেয়াই সবচেয়ে ভালো।

জটিলতা

উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে টাইফয়েড সংকটাপন্ন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। পরিপাকতন্ত্র থেকে রক্তপাত হতে পারে, এমনকি পরিপাকতন্ত্র ছিদ্র পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। এ রোগের কারণে হাড় বা সন্ধিতে প্রদাহ, মেনিনজাইটিস, পিত্তথলিতে ইনফেকশন, নিউমোনিয়া, শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফোঁড়া, স্নায়ুবিক সমস্যা ইত্যাদি হতে পারে। বিভিন্ন জটিলতা থেকে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

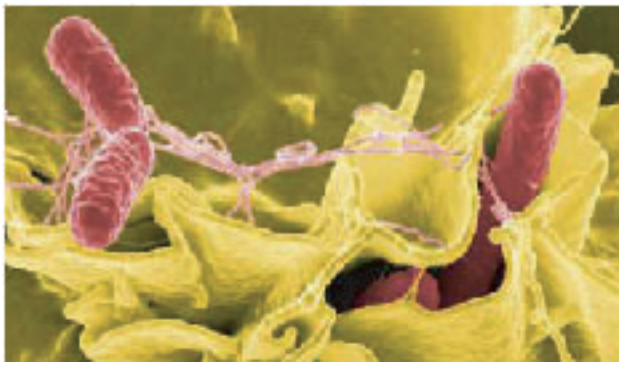

প্রতিরোধ

তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে টাইফয়েডের সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশ এর মধ্যে অন্যতম। তাই স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন দেশী-বিদেশী সংস্থা এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বাংলাদেশে টাইফয়েড চিকিৎসার চেয়ে এর প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি।

রোগটি প্রতিরোধে যা করতে হবে-

- বিশুদ্ধ পানি পান করা
- খাবার পরিস্কার রাখা
- পাস্তুরিত বা ফুটানো দুধ খাওয়া
- স্বাস্থ্যকর বর্জ নিস্কাশন ব্যবস্থা
- ব্যক্তিগত পরিছন্নতা

মোট কথা টাইফয়েড রোগ নিরাময়ে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। খাবার ও পানীয়ের পরিছন্নতার মাধ্যমেই এই জটিল রোগ এবং এর ভয়াবহ জটিলতা এড়ানো সম্ভব। শিশু-কিশোরদের জন্য এই রোগে বিশেষ সতর্কতা একান্ত আবশ্যক।

শাকসব্জি, ফলমূল এবং রান্নার বাসনপত্র পরিষ্কার পানিতে ধৌত করতে হবে। ভালভাবে রান্নাকৃত বা সিদ্ধকৃত খাবারই কেবলমাত্র গ্রহণ করতে হবে, খাবার প্রস্তুত বা পরিবেশনের পূর্বে খুব ভালভাবে হাত ধৌত করতে হবে।

ভালভাবে ফুটানো, পরিশোধিত বা বোতলজাত বিশুদ্ধ পানিই কেবলমাত্র পান করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে ফুটানো পানি বা পরিশোধিত পানি সংরক্ষণ করতে হবে এবং পানি যাতে দূষিত হতে না পারে সে জন্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে সংরক্ষণকৃত সেই পানি পান করতে হবে।

রাস্তার পার্শ্বস্থ দোকানের খাবার গ্রহণ এবং পানি পান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

টয়লেট ব্যবহারের পর ভালভাবে হাত পরিষ্কার করতে হবে, এছাড়া টয়লেট সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে।

এছাড়া টাইফয়েড হলে-

রোগীকে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে
রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে
আঁশযুক্ত খাবার, যেমন- শাকসব্জি পরিহার করতে হবে
তরল খাবার গ্রহণ করতে হবে

মনে রাখা উচিত

চিকিৎসা ছাড়াও যদি টাইফয়েড-এর উপসর্গগুলো এমনিতে বিতাড়িত হয় তারপরও *স্যালমোনেলা টাইফি* ব্যাকটেরিয়ার জীবাণু আক্রান্ত ব্যক্তির থাকতে পারে এবং এই অসুস্থতা পরবর্তীতে দেখা দিতে পারে বা আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে অন্যত্র বাহিত হতে পারে। টিকা নেয়ার পরেও খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় নির্বাচনে সতর্ক থাকতে হবে।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

এ্যাজমা শ্বাসনালীর এক ধরনের রোগ যে কারণে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসনালীতে প্রদাহের কারণে রোগটি দেখা দেয়। পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ্যাজমার প্রকোপে ভিন্নতা দেখা যায়। রোগী কখনো ভাল থাকেন আবার কখনো তীব্রভাবে উপসর্গগুলো প্রকাশ পায়। শ্বাসকষ্টের সাথে বাঁশির শব্দের মত আওয়াজ, বুক চেপে আসা এবং কাশি এ্যাজমার প্রধান উপসর্গ। যে সকল মানুষের এ্যাজমা থাকে তাঁদের শ্বাসনালী সাধারণ মানুষের থেকে বিভিন্ন এলার্জি উদ্রেককারী বস্তুতে অতিসংবেদনশীল থাকে।

সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৯৭০ সালের পর থেকে এ্যাজমা রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০ সালে বিশ্বব্যাপী এ্যাজমা রোগীর সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৩০ কোটি। আবার ২০০৯ সালে এ রোগে সারা পৃথিবীতে মৃত্যু বরণ করেছেন ২ লাখ ৫০ হাজার মানুষ। এতদসত্বেও সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে রোগটি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাল থাকা যায়।

এ্যাজমা কিভাবে হয়

এ্যালার্জেন (যে সমস্ত বস্তু শরীরে এ্যালার্জী উৎপন্ন করে) বা উত্তেজক বস্তুর সংস্পর্শে শ্বাসনালীর কোষগুলো ফুলে যায় এবং শ্বাসনালী সংকুচিত হয়। শ্বাসনালীর চারপাশের মাংস পেশী দ্রুত সংকুচিত হয় ফলে শ্বাসনালী আরও সরু হয়ে যায়। শ্বাসনালী হতে বেশি বেশি মিউকাস বের হয়ে শ্বাসনালীকে প্রায় বন্ধ করে ফেলে, ফলে শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয়।

এ্যাজমার উপসর্গ

এ্যাজমা মৃদু, মাঝারি বা তীব্র হতে পারে। এ্যাজমার উপসর্গগুলো নিম্নরূপ-

- বুক চেপে আসা অনুভূতি
- হুইজিং (বাঁশির মত করে শ্বাস ছাড়া ও নেয়ার শব্দ)
- দমবন্ধ হয়ে আসা অনুভূতি
- মুখ থেকে কফ বা লালা বের হওয়া
- কথা বলতে বা শ্বাস নিতে অসুবিধা হওয়া
- ঘুমের ব্যঘাত, বিশেষ করে শেষ রাতে।
- কাশি

এ্যাজমা বেড়ে গেলে যা হয়

এ্যাজমা বেড়ে গেলে যা হয়

শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে ব্যবহৃত বাতাস চলাচলের পথ সরু হয়ে যায়। ফুসফুসে বাতাস চলাচলের পথ এ সময় প্রদাহযুক্ত হয়ে ফুলে ওঠে। বাতাস চলাচলের কাজে ব্যবহৃত ফুসফুসের নালির মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং একই সঙ্গে সেখানে আঁঠালো পদার্থের নিঃসরণ ঘটে। যা স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসকে ব্যাহত করে।

যে সব জিনিস এ্যাজমার প্রবণতা বাড়ায়

- পোলেন।
- ভাইরাসজনিত শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ।
- দূষিত বাতাস, গাড়ি ও কলকারখানার ধোঁয়া।
- পশুর লোম।
- অনেক ক্ষেত্রে ব্যায়াম।

এ্যাজমার ধরন ও কারণ

এ্যাজমার দুটি প্রধান ধরন চিহ্নিত করা গেছে। প্রথমটিতে নাক, গলা, সাইনাস, এমনকি ফুসফুসেরও সংক্রমণ ঘটে, যাকে প্রায়শই ব্রংকাইটিস (Bronchitis) বলা হয়। দ্বিতীয়টি ব্যাপকতর। এটি একটি এলার্জিক বিক্রিয়া যা বংশগত ভাবে হতে পারে। এলার্জি ঘটিত এ্যাজমা রোগী ফুলের রেণু, গৃহস্থালীর ধুলাবালি, হাউজ মাইট, ছত্রাক, পশুর লোম, নির্দিষ্ট কিছু বস্তুর গন্ধ, কীটনাশক, বিশেষ খাবার অথবা ওষুধের প্রতি সংবেদনশীল হতে পারে। উভয় ধরনের এ্যাজমায় শ্বাসনালীর অভ্যন্তরীণ পথের মিউকাস আবরনী স্ফীত হওয়ার ফলে নালিগুলো সরু হয়ে যায় এবং মিউকাস রোধক তৈরী হয়। আবেগময় মানসিক চাপসহ বিভিন্ন কারণে এ্যাজমা আক্রমণ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। আর্দ্রতার পরিবর্তন (স্যাঁত স্যাঁতে ভাব), তাপমাত্রা, বায়ু দূষন ইত্যাদি এ্যাজমার আক্রমণ ত্বরান্বিত করে।

বংশগত কারণে এ্যাজমা

অনেক দিন আগে থেকেই জানা গেছে যে, পরিবারে একজন হতে বংশ পরম্পরায় অন্যদের মধ্যে এ্যাজমা রোগ হতে পারে। অল্প সংখ্যক এলার্জেন এর সংস্পর্শে এসেও এটোপিক শিশু (যার মা-বাবা যে কোন একজন এ্যাজমা বা অন্য এলার্জিক রোগে আক্রান্ত ছিল) প্রচুর পরিমাণে IgE এন্টিবডি তৈরী করে এবং ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে এ্যাজমা রুগীতে পরিণত হয়। চামড়ায় এলার্জি পরীক্ষা পদ্ধতিতে এধরনের এটোপিক শিশুদের সহজেই শনাক্ত করা যায়। এই শিশুদের পরবর্তীতে এ্যাজমা, এলার্জিক রাইনাইটিস, আর্টিকারিয়া, একজিমা প্রভৃতি রোগ হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। বংশগত হলেও এ্যাজমার জন্য সুনির্দিষ্ট একটি জিনকে শনাক্ত করা যায়নি বরং ব্যক্তিভেদে জিনের বিভিন্নতা আছে।

পরিবেশগত কারণ

এ্যাজমার কারণ নির্ণয়ে পরিবেশকে ভাল ভাবে শনাক্ত করা যায় যারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয়েছে তাদের উপর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। আর্থিকভাবে উন্নত, সচ্ছল, শহরে, আধুনিক পরিবেশে এ্যাজমার প্রকোপ বেশী দেখা যায়।

ঘরের ভিতরের পরিবেশ

শিশুদের এ্যাজমা হবার মূল কারণগুলো থাকে ঘরের ভিতরের পরিবেশে। হাউজ মাইট কার্পেটের ভিতরে থাকে। গরম আর্টিফিশিয়াল বিছানার তন্তু, পোষা পাখী বা প্রাণীর পালক থেকে এলার্জি হতে পারে। এছাড়া তেলা পোকা, ফাংগাল স্পোর প্রভৃতি থেকেও শিশুর এলার্জি শুরু হয়। রান্নার চুলা থেকে নির্গত নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, ধুমপানকারী মায়ের সন্তান এ্যাজমা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে বেশি।

ঘরের বাইরের পরিবেশ

বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড, ওজোন, সালফার ডাই অক্সাইড ও বায়ুবাহিত বিভিন্ন কণা এ্যাজমা রোগের উপসর্গ বাড়িয়ে দেয়। গাড়ির ধোঁয়াঁ, কলকারখানায় নির্গত ধোঁয়া, ডিজেল গাড়ির ধোঁয়ায় বিভিন্ন কণা থাকে যেখান থেকে এ্যাজমা রোগীর উপসর্গ বেড়ে যায়। ঘাস, ফুলের রেণু বাতাসে ভেসে বেড়ায় এবং এলার্জেন ও জলবায়ুর মিশ্র প্রক্রিয়া এ্যাজমা সংক্রমণ বাড়িয়ে দেয়। অনেক সময় দেখা গেছে, ধুলি ঝড় ও মৌসুমী বায়ুর সময়ে তীব্র এ্যাজমার প্রকোপ দেখা দেয়।

কাজ/কর্মস্থল

অনেক মানুষের কর্মস্থল থেকে এ্যাজমা রোগ দেখা দেয়। যেমন- কাঠমিস্ত্রীদের কাঠের গুড়া থেকে, টিনের কারখানায় অ্যাসবেসট্স থেকে, চামড়ার কারখানায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রং বা কেমিক্যাল থেকে।

ওষুধ

বিটা ব্লকার ওষুধ চোখের ড্রপ হিসাবে ব্যবহার করলে বা খেলে এ্যাজমা উপসর্গ বেড়ে যায়। এসপিরিন বা ব্যথা নাশক ওষুধ খেলে অনেকের এ্যাজমা বেড়ে যায়।

এ্যাজমা রোগ নির্ণয়

সাধারণত রোগের ইতিহাস, শারীরিক পরীক্ষা ও ল্যাবরেটরী টেস্টের মাধ্যমে এ্যাজমা রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

রোগের ইতিহাস

সাধারণত সর্বস্বীকৃত চারটি উপসর্গের মাধ্যমে এ্যাজমা নির্ণয় করা যায়

- ছোট ছোট শ্বাস নেওয়া বিশেষ করে পরিশ্রম করলে বা শেষ রাতে ঘুমের সময়।
- প্রতিটি শ্বাসের সাথে হুইজিং (Wheezing) বা বাঁশির শব্দের মত আওয়াজ।
- কাশি যা থেকে থেকে বার বার হয়। দীর্ঘস্থায়ী হয়। শেষ রাতে বা পরিশ্রম করলে বা শুষ্ক ঠান্ডা আবহাওয়ার মধ্যে গেলে হয়।
- বুক ভারী হয়ে আসা।

শারীরিক পরীক্ষা

গলা, মুখ, নাক পরীক্ষা ও স্টেথোস্কোপের সাহায্যে বুক পরীক্ষা করলে বুকের মধ্যে বিশেষ শব্দ পাওয়া যায়। শরীরে একজিমা বা এলার্জির অন্য চিহ্ন পাওয়া যেতে পারে।

ল্যাবরেটরী পরীক্ষা

(১) স্পাইরোমেট্রি (Spirometry) দিয়ে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা - এই পরীক্ষার প্রথমে সরাসরি স্পাইরোমিটারে ফুঁ দিতে হয় এবং পরে এ্যাজমা নিরামক ওষুধ যেমন স্যালবুটামল ইনহেলার প্রয়োগ করে আবার ফুঁ দিতে বলা হয় এবং ফলাফল থেকে এ্যাজমা নির্ণয় করা যায়।

(২) এছাড়াও বুকের এক্সরে, রক্তে এলার্জি টেষ্ট, চামড়ায় এলার্জি টেস্টের মাধ্যমেও এ্যাজমা রোগ ও এর কারণ নির্ণয় করা হয়।

এ্যাজমা নিয়ন্ত্রণে রুটিন কাজ

দৈনিক পিক ফ্লো মিটারের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসের অবস্থা জানা যায়। রোগী কতটুকু ভালভাবে শ্বাস নিতে পারছে পিক ফ্লো মিটারের ফলাফল থেকে সহজেই নির্ণয় করা যায়।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর পিক ফ্লো মাপা যেতে পারে। যদি পিক ফ্লোর ফলাফল স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয় তাহলে বুঝতে হবে প্রয়োজন মতো বাতাস ফুসফুস নিতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। জেনে নিতে হবে যেসব ওষুধ (ইনহেলার/ট্যাবলেট) চলছে সেগুলোর কোনোটির ডোজ বাড়াতে হবে কিনা। অথবা নতুন কোন ওষুধ যোগ করতে হবে কিনা। তবে একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন, এ্যাজমা নিয়ন্ত্রণে বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ কিংবা এ্যাজমা বিষয়ে প্রশিক্ষিত মেডিসিন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া ভাল। সবচেয়ে ভাল হয় পালমোনলজিষ্ট বা ফুসফুস বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা নেয়া।

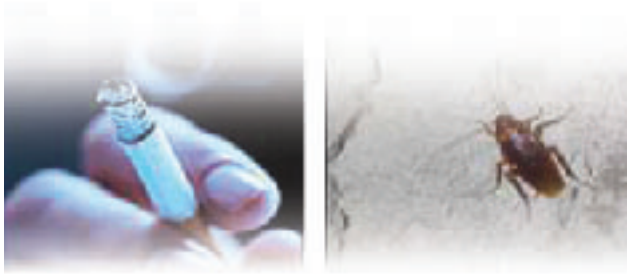

চিকিৎসা

এ্যাজমা চিকিৎসার প্রধান উপায় দুটি - যে সমস্ত কারণে এ্যাজমা হচ্ছে সেই জিনিসগুলো এড়িয়ে চলা এবং এ্যাজমা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য ওষুধ গ্রহণ করা।

এ্যাজমা উপশম নিয়ন্ত্রনের ওষুধগুলো হচ্ছে-

- স্যালবিউটামল, অ্যালবিউটারল, স্যালমেটেরল, লেভো স্যালবিউটামল (β_2 agonist)
- ইপ্রাটোপিয়াম (Anticholinergic)
- প্রেডনিসোলন, হাইড্রোকর্টিসন (Corticosteroid)

এ্যাজমা প্রতিরোধক ওষুধগুলো হচ্ছে-

- ইনহেল্ড কর্টিকোস্টেরয়েড যেমন ফ্লুটিকাসন, বেকলোমেথাসন ইত্যাদি
- নেডোক্রেমিল
- এন্টি লিউকোট্রাইন যেমন মন্টেলুকাস্ট
- থিয়োফাইলিন

ইনহেলার ব্যবহার পদ্ধতি

ইনহেলার ব্যবহার পদ্ধতি কোন বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ কিংবা প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের কাছ থেকে অবশ্যই শিখে নিতে হবে।

ইনহেলারের ওষুধ গভীর শ্বাসের সঙ্গে টেনে গ্রহণ করতে হয়। কাজেই ইনহেলারের ওষুধ মুখে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই শ্বাস টানতে হবে, তা না হলে ওষুধ মুখে রয়ে যাবে। সুতরাং ইনহেলারের কৌটায় চাপ দেয়া এবং গভীরভাবে শ্বাস টানা -এ দুটি কাজ একই সমন্বিতভাবে করতে হবে। ইনহেলার গ্রহণের পদ্ধতিটি এ কারণেই ততটা সহজ নয়। তাছাড়া শ্বাসের সঙ্গে ওষুধ টেনে কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে রাখতে হয়। ইনহেলারের সঠিক ব্যবহার যেমন এ্যাজমা থেকে আরোগ্য করে তেমনি ভুল ব্যবহারে রোগের উপশম হয় না। তাই ইনহেলার ব্যবহার পদ্ধতির ওপর জোর দিতে হবে। এ ব্যাপারে চিকিৎসকের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। যে চিকিৎসক রোগীকে ইনহেলার ব্যবহার পদ্ধতি শেখানোর ব্যাপারে যত্নবান বুঝতে হবে তিনি রোগীর এ্যাজমা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বেশী তৎপর। ইনহেলারের ব্যবহার তথা এ্যাজমা চিকিৎসার বিষয়টি শুধু ওষুধ লিখে দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এখানে ইনহেলারের ব্যবহার পদ্ধতি, ব্যবহার বিধি ও মাত্রারও বিরাট গুরুত্ব আছে।

কিভাবে এ্যাজমা আক্রমণ কমানো যায়

এলার্জেন ও ইরিট্যান্ট এড়িয়ে চলে এ্যাজমার আক্রমণ হতে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। কিছু সাধারণ এলার্জেন ও ইরিট্যান্ট হচ্ছে

- বায়ু দূষন
- ধুলা
- মোল্ড
- ফুলের রেণু
- সিগারেটের ধোঁয়া
- পোষা প্রাণীর লোম বা পালক
- ব্যায়াম
- তাপমাত্রার পরিবর্তন
- কোন কোন খাবার
- এসপিরিন, আইবুপ্রোফেন
- গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন
- সাইনাস সংক্রমণ
- অতি আবেগ (বেশি হাসি বা কান্না)
- পারফিউম বা ডিওডোরেন্ট
- ভাইরাস সংক্রমণ

কখন ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন

এ্যাজমা খুব সহজেই এ্যাজমা বিষয়ে প্রশিক্ষিত বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও তত্ত্বধানে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। তবে এ্যাজমা কখনো কখনো তীব্র আকার ধারণ করে জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে। তীব্র এ্যাজমা আক্রান্ত অবস্থায় কিছু উপসর্গ ও লক্ষণ দেখে বোঝা যেতে পারে যে, রোগীকে এখনই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে কিংবা হাসপাতালে নিতে হবে। সেসব উপসর্গ ও লক্ষণগুলো হচ্ছে-

- যদি তীব্র শ্বাসকষ্ট হয়।
- শ্বাসকষ্টের কারণে যদি কথা বলতে ব্যর্থ হয় বা কথা বলতে অসুবিধা হয়।
- প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় যদি বাঁশির মতো আওয়াজ হয়।
- রোগী যদি দাড়াতে গিয়ে শ্বাসকষ্টের কারণে বসে পড়ে আবার ভালভাবে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করতে থাকে।
- কোন কিছু পান বা খেতে না চাইলে বা না পারলে।
- ইনহেলার ব্যবহারের ১৫ মিনিটের মধ্যেও অবস্থার উন্নতি না হলে।

যেহেতু এ্যাজমার কারণে মৃত্যু হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। কাজেই এ্যাজমার তীব্রতা বাড়লে রোগীকে দ্রুত এ্যাজমা চিকিৎসার সুবিধা আছে এমন হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

শিশুদের স্থূলতা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিশুদের স্থূলতা বা মোটা হয়ে যাবার প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। আমেরিকাতে প্রায় ১৬ শতাংশ শিশু এবং ৩৩ শতাংশ কিশোর স্থূল। স্থূলতা সহজেই শনাক্ত করা যায় কিন্তু চিকিৎসা করা তেমনই কঠিন। অস্বাস্থ্যকর ওজন বৃদ্ধি হওয়ার মূল কারণ খাবারের বদ অভ্যাস এবং শরীর চর্চার অভাব। ফলে বছরে তিন লক্ষ মানুষ মৃত্যু বরণ করে। স্থূল শিশু পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে স্থূল মানুষে পরিণত হয় যারা সমাজের জন্য বোঝা স্বরুপ।

স্থূলতা কি

অল্প কিছু ওজন বাড়লেই তাকে স্থূল বলা যায় না। সাধারণ একটি শিশুর নির্দিষ্ট উচ্চতা ও দৈহিক আকারের অনুপাতে যে ওজন থাকা উচিত তার থেকে ১০ শতাংশ ওজন বেশী থাকলে তাকে স্থূল বলা হয়। সাধারণত ৫/৬ বছর বয়সে বা কিশোর অবস্থায় ওজন বেড়ে যাবার প্রবণতা দেখা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে ১০ হতে ১৩ বছর বয়সের স্থূল শিশুদের ৮০ শতাংশ বয়স্ক অবস্থায়ও স্থূলাকার হয়ে থাকে।

স্থূলতার কারণ

স্থূলতার কারণ জটিল বা নানাবিধ যেমন- বংশগত, জীববৈচিত্র (Biological), আচরণগত এবং সাংস্কৃতিক কারণ। একটি শিশু তখনই স্থূল হতে শুরু করে যখন সে যতটুকু খাবার গ্রহণ করেছে, তার থেকে কমশক্তি খরচ করে। মাতা বা পিতা মোটা হয়ে থাকলে ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে শিশুও মোটা হয়ে থাকে। আর মাতা-পিতা উভয়ে মোটা হলে শিশুর মোটা হবার সম্ভাবনা শতকরা ৮০ ভাগ। কিছু চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে শিশু মোটা হতে পারে কিন্তু তার পরিমান শতকরা ১ ভাগেরও কম।

শিশু ও কিশোর বয়সে মোটা হবার কারণ

- খাবারের বদঅভ্যাস
- বেশি বেশি খাবার অভ্যাস
- শরীর চর্চার অভাব
- পারিবারিক স্থূলতার ইতিহাস
- কিছু রোগের কারণে (স্নায়ুতন্ত্র বা হরমোন রোগের কারণে) ওষুধ (স্টেরয়েড বা মানসিক রোগের ওষুধ)
- জীবনের অস্বাভাবিক ঘটনা বা পরিবর্তন (স্বামী-স্ত্রীর আলাদা থাকা, বিবাহ বিচ্ছেদ, কারও মৃত্যু ইত্যাদি)
- পারিবারিক টানা পোড়ন
- নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লোপ
- বিষন্নতা বা অন্যান্য মানসিক সমস্যা।

স্থূলতার ঝুঁকি ও জটিলতা

স্থূলতার কারণে নানা রকমের ঝুঁকি ও জটিলতা দেখা যায়। শারীরিকভাবে সমস্যাগুলো নিম্নরূপ-

- হৃদরোগ হবার ঝুঁকি বেড়ে যায়
- উচ্চ রক্তচাপ
- ডায়াবেটিস
- শ্বাস কষ্ট
- ঘুমের ব্যঘাত

শিশু ও কিশোর স্থূলদের আবেগজনিত সমস্যা হতে থাকে। খেলার সাথীদের মধ্যে কম জনপ্রিয় বা অবহেলার পাত্র হয়ে যায় এবং নিজেদের কাজের দক্ষতা কমে যায়। ফলে বিষন্নতা, উদ্বেগ, মানসিক রোগ ইত্যাদি দেখা দেয়।

চিকিৎসা

শিশু বিশেষজ্ঞ বা পারিবারিক চিকিৎসক প্রথমেই দেখবেন স্থূলতার জন্য শিশুর কোন শারীরিক কারণ আছে কিনা। তা যদি না থাকে তাহলে স্থূলতা কমানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে শিশুর শারীরিক ব্যায়াম বৃদ্ধি করা ও খাবারে ক্যালরির পরিমাণ কমানো। শিশুর আত্ম-উপলব্ধি বৃদ্ধি করে নিয়মিত হারে ওজন কমানো সম্ভব। পরিবারে একাধিক স্থূল ব্যক্তি থাকলে স্বাস্থ্যকর খাদ্য তালিকা ও ব্যায়াম পারিবারিক ভাবে শুরু করলে শিশু কিশোরদের ওজন নিয়ন্ত্রণ সহজ করে।

শিশু কিশোরদের ওজন কমাতে যা মনে রাখতে হবে-

- ওজন কমানোর জন্য একটি পরিকল্পনা করতে হবে, খাবার অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে, ধীরে ধীরে খেতে হবে
- উপযুক্ত খাবার পছন্দ করতে হবে (কম চর্বিযুক্ত খাবার খেতে হবে, ফাস্ট ফুড এড়িয়ে চলতে হবে)
- কম ক্যালরিযুক্ত খাবার খেতে হবে
- হাঁটার অভ্যাস করতে হবে এবং জীবন যাত্রায় গতি আনতে হবে
- শিশুরা স্কুলে কি খাচ্ছে জেনে সেখানে খাবার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে
- টিভি বা কম্পিউটারের সামনে না বসে পরিবারের সবাই একত্রে বসে খেতে হবে
- খাবারকে কখনই উপহার হিসেবে নেয়া যাবে না
- খাবার নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়েকজন মিলে একটি দল তৈরী করতে হবে

স্থূলতা একটি দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা কিছুদিন পর আবার পুরাতন জীবন যাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসে ফিরে গিয়ে পুনরায় মোটা হয়ে যায়। তাই নির্দিষ্ট ওজন বজায় রাখতে অবশ্যই শিশুকে নিয়মিত খাবার ও ব্যায়ামের জন্য উপদেশ দিতে হবে। স্থূল শিশুর পিতা-মাতা সর্বদা চেষ্টা করবে যেন শিশুর নিজের আত্ম-উপলব্ধি হয় নিজের সমস্যার ব্যাপারে এবং উন্নত স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার জন্য শিশু নিজেই যেন সব সময় উদ্যমী হয়।

স্থূল শিশুর মানসিক সমস্যা সমাধানে শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে বা পারিবারিক চিকিৎসকের মাধ্যমে সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে হবে যেন ওজন কমানোর পাশাপাশি শিশু-কিশোর মানসিক সমস্যা কাটিয়ে পরিবার ও সাথীদের সাথে সহজে মিশে যেতে পারে। তবেই হবে স্থূল শিশু-কিশোরের প্রকৃত চিকিৎসা।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

রোগ প্রতিরোধে টিকা

আমাদের দেশের শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ সংক্রামক ব্যাধি। তবে সময়মত টিকা দিয়ে শিশুকে জীবনঘাতি সংক্রামক রোগ থেকে বাঁচানো সম্ভব। রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেয়। সময়মত টিকা দিয়ে যে কয়টি সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায় তার মধ্যে ডিপথেরিয়া, ধনুস্টংকার, হুপিংকাশি, হাম, যক্ষা, পোলিওমাইলাইটিস, হেপাটাইটিস-বি, টাইফয়েড ও জলবসন্ত হল অন্যতম। টিকা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। টিকা শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করে যা শরীরে রোগের সংক্রমণের আগেই জীবাণুকে ধ্বংস করে দেয়। কখনও কখনও ভ্যাকসিনেশনকে ইমিউনাইজেশন বা টিকা দান ও বলা হয়।

কোন টিকা কোন রোগ প্রতিরোধ করে

- টিকা দিয়ে যে সব রোগ প্রতিরোধ করা যায় সেগুলো হচ্ছে-
- ডিপিটি টিকা- ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি এবং ধনুস্টংকার রোগ থেকে শিশুকে রক্ষা করে।
- বিসিজি টিকা- যক্ষা রোগ থেকে শিশুকে রক্ষা করে।
- হামের টিকা- হাম রোগ থেকে শিশুকে রক্ষা করে।
- ওপিভি (ওরাল পোলিও টিকা)-পোলিও রোগ থেকে শিশুকে রক্ষা করে।
- টিটি (টিটেনাস টক্সয়েড)-নবজাতক এবং মায়েদেরকে এবং পূর্ণবয়স্ক যে কোনো পুরুষ ও মহিলাকে ধনুস্টংকার থেকে রক্ষা করে।
- হেপাটাইটিস-বি টিকা - হেপাটাইটিস-বি, নামক মারাত্মক রোগ থেকে শিশুকে রক্ষা করে।

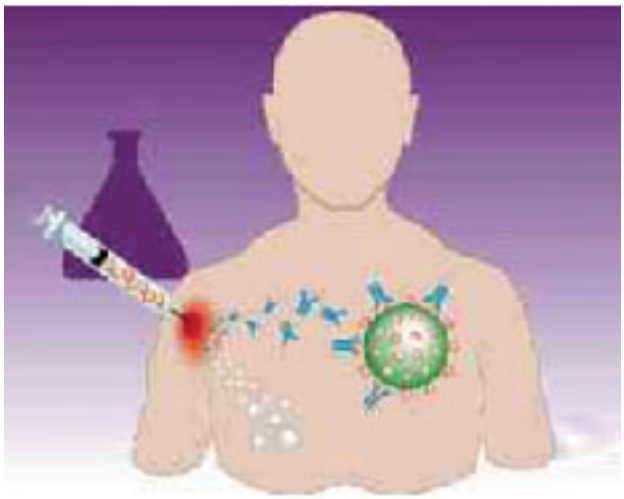

কোন বয়সে শিশুদের টিকা দিতে হয়

জীবনঘাতি সংক্রামক রোগ হতে কার্যকরভাবে শিশুদের রক্ষা করতে হলে প্রতিটি টিকাই নির্দিষ্ট বয়সে ও সময়ে প্রদান করতে হবে। টিকাদান কার্যক্রম সফল করে তোলার জন্য ইপিআই নিম্নলিখিত নীতিমালা তৈরি করেছে।

- বিসিজি জন্মের পরপরই দিতে হবে। জন্মের ৬ সপ্তাহ বয়স থেকে স্বাভাবিক কোর্স প্রদান করতে হবে।
- ছয় সপ্তাহ থেকে ৯ মাস বয়সের শিশু টিকাদানকারীর সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময়ই এক ডোজ বিসিজি ও ডিপিটি-র প্রথম ডোজ গ্রহণ করতে পারে।

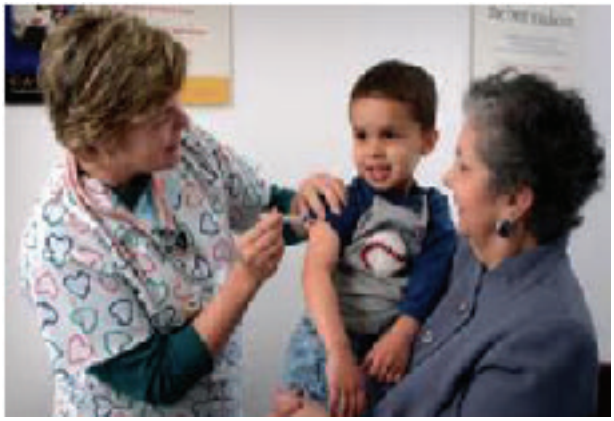

- নয় মাস থেকে ২ বছর বয়সী কোনো শিশু টিকাদানকারীর সাথে তার প্রথম সাক্ষাতের সময়ই বিসিজি ও হামের এক ডোজসহ ডিপিটি ও ওপিভির প্রথম ডোজ একই সাথে গ্রহণ করতে পারে।
- যে কোনো বা সবগুলো ইপিআই টিকা একই সময়ে নিরাপদ ও কার্যকরভাবে প্রদান করা যায়।
- ডিপিটি ও ওপিভির মাঝের ন্যূনতম বিরতি হলো ৩ সপ্তাহ। এই বিরতির কোনো সর্বোচ্চ সীমা নেই। এমন কি প্রথম ডোজ দেয়ার পর যদি এক বছরও পেরিয়ে যায় তবুও তাকে পুনরায় প্রথম ডোজ থেকে শুরু না করে দ্বিতীয় ডোজ দিতে হবে।
- গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসে টিটি প্রদান এড়িয়ে যেতে হবে। গর্ভাবস্থায় প্রথম ডোজ টিটি টিকা প্রদানের ৪ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় ডোজ প্রদান করতে হবে। দ্বিতীয় ডোজ অবশ্যই প্রসবের ১ মাস পূর্বে দিতে হবে।

টিকা যেভাবে শরীরে কাজ করে

অধিকাংশ টিকার মধ্যে নির্দিষ্ট রোগের সীমিত সংখ্যক মৃত বা দুর্বল জীবাণু থাকে যা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে রোগ সংক্রমণ করতে পারে না। কিন্তু এর উপস্থিতিতে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (এন্টিবডি) তৈরী হয়। ফলে পরবর্তীতে একই রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঐ জীবাণুকে শনাক্ত করে ধ্বংস করে দেয়। কখনও কখনও জীবাণু না দিয়ে তার অংশ বিশেষ দিয়েও টিকা তৈরী করা হয়। মানুষের শরীরে এন্টিবডি দুই ভাবে তৈরী হয় ঃ টিকার মাধ্যমে এবং কখনও রোগে আক্রান্ত হয়ে। এন্টবডি শরীরে বহুবছর টিকে থাকে এবং পরবর্তীতে রোগজীবাণু প্রবেশ করলে তাকে কিভাবে ধ্বংস করতে হবে সেটা মনে রাখে। এমনকি সারা জীবনের জন্যও টিকা রোগ প্রতিরোধে কাজ করে।

ইপিআই নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিটি টিকার সঠিক ডোজ ও সময় চার্টে দেয়া হলো

রোগের নাম	টিকার নাম	টিকার মাত্রা	মাত্রার মধ্যে বিরতি	মাত্রার সংখ্যা	টিকা শুরু করার সঠিক সময়	কোন বয়সে টিকা শেষ	টিকাদানের স্থান	টিকার প্রয়োগ পথ
যক্ষ্মা	বিসিজি	০.০৫ এম এল	-	১	জন্মের পর থেকে	১ বছর	বাম বাহুর উপরের অংশে	চামড়ার মধ্যে
ডিপথেরিয়া হুপিংকাশি ধনুষ্টংকার	ডিপিটি	০.০৫ এম এল	৪ সপ্তাহ	৩	৬ সপ্তাহ	১ বছর	উরুর মধ্য ভাগের বহিরাংশে	মাংস পেশি
পোলিও	মাইলাইটিস ওপিভি	২-৩ ফোঁটা	৪ সপ্তাহ	*৪	৬ সপ্তাহ	১ বছর	মুখে	মুখে
হাম	হামের টিকা	০.০৫ এম এল	-	১	২৭০ দিন (৯ মাস)	১ বছর	উরুর মধ্য ভাগের বহিরাংশে	চামড়ার নিচে
ধনুষ্টংকার	টিটি	০.০৫ এম এল	৪ সপ্তাহ ৬ মাস ১ বছর ১ বছর	৫ ডোজ	১৫ বছর	অতিশীঘ্র	বাহুর উপরের অংশে	মাংস পেশিতে

* ওপিভি টিকা মোট ৪ (চার ডোজ) দিতে হবে। ৪র্থ ডোজটি হামের টিকার সাথে দিতে হবে।
** পূর্বে ডিপিটি টিকা না দিলে গর্ভাবস্থায় ৪র্থ ডোজ নিতে হবে। ২য় ডোজটি ১ মাস পর অথবা প্রসবের কমপক্ষে ১ মাস আগে অবশ্যই নিতে হবে। পূর্বের টি টি টিকা নিলে পরবর্তী গর্ভাবস্থায় ১টি টিটি ডোজ প্রসবের কমপক্ষে ১ মাস পূর্বে নিতে হবে।

একটি টিকা থেকে একটি নির্দিষ্ট রোগ প্রতিরোধ করা যায়। আবার কখনও একটি টিকার মাধ্যমে একাধিক রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যেমন MMR টিকার সাহায্যে হাম, মাম্পস ও রুবেলা তিনটি রোগের প্রতিষেধক শরীরে তৈরী হয়।

কার্যকারিতা

টিকা রোগের সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা দিতে পারে কিনা তার নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে যাকে টিকা দেওয়া হচ্ছে তার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হয়তো উজ্জীবিত নাও হতে পারে। যাকে টিকা দেওয়া হচ্ছে তার নিজস্ব এন্টিবডি তৈরীর ক্ষমতা নাও থাকতে পারে বা এইডস, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগের কারণে বা স্টেরয়েড নেয়ার কারণে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল থাকতে পারে।

টিকার কার্যকারিতা নির্ভর করে বেশ কিছু কারণে, যেমন -

- কোন কোন রোগে টিকা কার্যকরী আবার কোনটাতে টিকা কার্যকরী নয়
- টিকায় ব্যবহৃত জীবাণুর প্রকার বা সংখ্যা
- টিকার সময়সীমা অনুসরণ না করলে
- সঠিক নিয়মে টিকা দিলেও কেউ কেউ নিজের শরীরে এন্টিবডি তৈরীতে অক্ষম থাকলে
- বিভিন্ন দেশের মানুষের নিজস্ব জাতিগত, বয়স বা বংশগত বিশেষত্বের কারণে।

কখনও কখনও টিকা প্রাপ্ত রোগীর শরীরেও ঐ রোগ সংক্রমণ হতে পারে তবে তখন রোগের উপসর্গ বা ভয়াবহতা অনেক কম হবে।

টিকার প্রোগামে যা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়

- রোগটি মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা
- নতুন টিকার ক্ষেত্রে পরবর্তী রোগ সংক্রমণ হার
- রোগটির সম্ভাবনা বিরল হলেও উচ্চ টিকা হার বজায় রাখা

উদাহরন স্বরুপ বলা যায় ১৯৫৮ সালে নতুন টিকা হিসেবে হামের টিকা আমেরিকাতে দেয়া শুরু হল তখন রোগ সংক্রমণ ছিল ৭,৬৩,০৯৪ জন ও মৃত্যু হয়েছিল ৫৫২ জনের। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে আমেরিকাতে মাত্র ৬৪ জনকে হাম আক্রান্ত শনাক্ত করা গেছে যাদের ৫৪ জনই বহিরাগত।

টিকা মারাত্বক রোগ প্রতিরোধ করে

টিকা যে সমস্ত মারাত্বক রোগ থেকে আমাদের রক্ষা করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

ডিপথেরিয়া - শিশুদের মারাত্বক শ্বাসকষ্ট হয়। এই রোগে শিশুর হার্ট, স্নায়ুতন্ত্রকে দুর্বল করে ও প্যারালাইসিস করে দেয়।

টিটেনাস - জং ধরা পেরেক পায়ে ফুটলেই মানুষ টিটেনাসে আক্রান্ত হওয়ার ভয় পায়। ধুলা, মানুষের মল, সার ইত্যাদির মধ্যেও টিটেনাসের জীবাণু থাকে। শিশুর কোন ক্ষতে জীবাণু প্রবেশ করলেই শিশুর মাংসে টান পড়া, খিঁচুনী ও মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

পারটুসিস (হুপিংকফ) - এই রোগে ভয়ানক কাশি হতে থাকে, বমি হয় ও দম বন্ধ হয়ে আসে। এটা এক সপ্তাহ থেকে মাসাধিক কাল প্রলম্বিত হয় এবং মৃত্যুও হতে পারে। ৬ মাসের নীচে শিশুর এই রোগ সংক্রমণে মৃত্যু নিশ্চিত।

পোলিও - শিশুর স্নায়ুতন্ত্রে সংক্রমণ হয়ে এই রোগে মানুষ বিকলাংঙ্গ ও অবশ হয়ে যায় এবং মৃত্যুও হতে পারে।

হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ-বি (HIB) - এই রোগে মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ড আক্রান্ত হয়। সঙ্গে নিউমোনিয়া, কালো হয়ে যাওয়া এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

হাম - উচ্চ জ্বর, গায়ে ফুসকুড়ি, কাশি, সর্দি ইত্যাদি প্রায় ১-২ সপ্তাহ থাকে। সঠিক চিকিৎসা না হলে পরে নিউমোনিয়া, খিঁচুনী ইত্যাদি হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে।

মাম্পস - এই রোগে জ্বর, মাথা ব্যথা, কানের নীচে চোয়াল ফুলে যায়, সাথে মেনিনজাইটিস হতে পারে। কখনও কখনও পরবর্তীতে মেয়েদের সন্তান উৎপাদন করার ক্ষমতা লোপ পায়।

রুবেলা - হামের মতই উপসর্গ তবে গর্ভবতী মায়ের এই রোগ হলে গর্ভস্থ শিশুর জন্য খুবই বিপদজনক। অনেক ক্ষেত্রে গর্ভপাত হতে পারে।

ভ্যারিসেলা (চিকেনপক্স) - জ্বর, র‍্যাশ, ফোস্কা ইত্যাদি এই রোগের উপসর্গ। কখনও ত্বকে অনেক ইনফেকশন হয়ে যায়। জটিলতা হিসেবে নিউমোনিয়া, মস্তিষ্কের ক্ষতি ও মৃত্যুও হতে পারে।

হেপাটাইটিস বি - এই রোগ লিভারে প্রদাহ সৃস্টি করে যা পরবর্তীতে লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে।

নিউমোকক্কাল - এই রোগে সংক্রমণ হলে মেনিনজাইটিস, নিউমোনিয়া হতে পারে। ফলে শিশু বধির ও মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে।

মেনিনগোকক্কাল - এই জীবাণু দ্বারা শিশুর স্নায়ুতন্ত্র বা রক্ত সংক্রমিত হয় এবং মৃত্যুও হতে পারে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা - এই জীবাণু দ্বারা শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ হয় যা শিশুদের জন্য একটি মরণ ব্যাধি।

জেনে রাখা ভালো

- টিকার জায়গায় গরম সেঁক দেয়া যাবে না।
- প্রথম ডোজ কিংবা দ্বিতীয় ডোজ টিকা নেবার পর পরবর্তী ডোজ টিকা নিতে যদি কোনো কারণে কয়েক মাস দেরি হয়ে যায়, পরবর্তী ডোজগুলো নিয়মিত নিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে আপনার চিকিৎসক আপনাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন।
- বিসিজি দেবার পর টিকার জায়গায় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা না গেলে চিকিৎসককে জানাতে হবে। এই প্রতিক্রিয়া সাধারণত ৩ সপ্তাহের মধ্যে দেখা যায় (প্রতিক্রিয়া হিসেবে টিকার জায়গা লাল হয়ে ফুলে যাবে, সামান্য পুঁজ হবে, যা ২/৩ মাসের মধ্যে আপনিতেই ভালো হয়ে যাবে)। টিকার জায়গায় হঠাৎ বেশি ঘা হয়ে গেলে অথবা টিকা দেয়া হাতের বগলে গ্ল্যান্ড ফুলে গেলে চিকিৎসককে জানাতে হবে।
- অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু, সাধারণ সর্দি-কাশি, ডায়রিয়া, জ্বরজনিত খিঁচুনি, শিশুর মস্তিষ্ক-পক্ষাঘাত (সেরিব্রাল পালসী) ইত্যাদি রোগ হলে টিকা দিতে বাধা নেই। তবে এসব শিশুদের ডিপিটি দেবার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- কোনো টিকা দেবার পর মারাত্বক ধরনের এলার্জিক প্রতিক্রিয়া হলে, খুব বেশি জ্বর হলে কিংবা শিশুর জন্মগত কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে টিকা দেবার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।
- টিকা দেবার আগে নিশ্চিত হতে হবে যে টিকা সঠিক তাপমাত্রায় রক্ষিত ছিল কিনা এবং ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা।

- টিকা দেবার পর এলার্জিক প্রতিক্রিয়া হলে, শিশু অনবরত কাঁদলে, তার মারাত্বক অবস্থা হলে, মাথার তালু ফুলে গেলে, খিঁচুনি হলে, বেশি জ্বর হলে, টিকার জায়গা ফুলে সংক্রমণ হয়ে গেছে আশংকা হলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে জানাতে হবে।
- প্রত্যেক হাসপাতালেই নির্ভরযোগ্য টিকাদান কেন্দ্র আছে। হাসপাতাল ছাড়াও টিকাদান কেন্দ্রগুলোতে টিকা দেয়া যায়। শিশু বিশেষজ্ঞসহ অনেক চিকিৎসকের চেম্বারেও টিকা দেয়া হয়।

আপনার শিশুকে সুরক্ষায় সময় মত টিকা দিন।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

সিপ্রোসিন® চোখ/কানের ড্রপস্
সিপ্রোফ্লক্সাসিন ইউএসপি ০.৩%

সিপ্রোসিন® চোখ/কানের ড্রপস্ হলো জীবাণুমুক্ত দ্রবণ যাতে আছে সিপ্রোফ্লক্সাসিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি যা একটি সংশেষিত বৃহত্তর পরিধির ফ্লোরোকুইনোলোন জীবাণু বিরোধী ওষুধ। ইহা ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ গাইরেজ প্রতিহত করে তার বৃদ্ধিকে বন্ধ করে কাজ করে।

উপাদান
প্রতি মি.লি.-এ আছে সিপ্রোফ্লক্সাসিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি যা ৩.০ মি.গ্রা. সিপ্রোফ্লক্সাসিন এর সমতুল্য।

নির্দেশনা
চোখে ব্যবহার
সিপ্রোসিন® চোখ/কানের ড্রপস্ সংবেদনশীল জীবাণু সৃষ্ট সংক্রমণে নিম্নবর্ণিত জীবাণুর বিরুদ্ধে নির্দেশিত -

কর্নিয়ার আলসার: সিউডোমোনাস অরোজিনোসা, সেরাটিয়া মারসিসেন্স, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস ইপিডারমিস, স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি, স্ট্রেপটোকক্কাস ভিরিডেন্স।

ব্যাকটেরিয়াল কনজাংটিভাইটিস: হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস ইপিডারমিস, স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি। ইহা চোখের পাতার প্রদাহ, চোখের পাতা এবং কনজাংটিভা প্রদাহ, অশ্রুস্রাবী গ্রন্থির প্রদাহ, নেইসিরিয়া গনোরিয়া এবং ক্ল্যামাইডিয়া ট্রেকোমেটিস জীবাণু সৃষ্ট চোখের সংক্রমণ প্রতিষেধনে, কর্ণিয়ার বা বাহিরের কোন বস্তুর দূরীকরণজনিত চোখের অস্ত্রোপচারের পূর্বে এবং পরে চোখের সংক্রমণ প্রতিরোধে উপকারী।

কানে ব্যবহার
ওটাইটিস এক্সটারনা, একিউট ওটাইটিস মিডিয়া, ক্রণিক সুপারেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ইহা কানের অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে ইনফেকশনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে। যেমন- মাস্টয়েড সার্জারী।

প্রয়োগমাত্রা ও বিধি
চোখে প্রয়োগ
কর্ণিয়ার ক্ষত: প্রথমদিন প্রথম ৬ ঘন্টার জন্য আক্রান্ত চোখে ১৫ মিনিট পরপর ২ ফোঁটা করে প্রয়োগ করতে হবে এবং দিনের অবশিষ্ট সময়ে আক্রান্ত চোখে ৩০ মিনিট পর পর ২ ফোঁটা করে প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয় দিন প্রতি ঘন্টা পর পর ২ ফোঁটা করে আক্রান্ত চোখে প্রয়োগ করতে হবে। তৃতীয় দিন থেকে চৌদ্দ দিন পর্যন্ত প্রতি ৪ ঘন্টা পর পর ২ ফোঁটা করে আক্রান্ত চোখে প্রয়োগ করতে হবে। যদি ১৪ দিনের বেশী রোগীর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় এবং কর্ণিয়ার পুনঃ ইপিথেলিয়াম দেখা না দেয় তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী উভয় ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ ২১ দিন পর্যন্ত চিকিৎসাকাল সুপারিশকৃত।

ব্যাকটেরিয়া জনিত কনজাংটিভার প্রদাহ: স্বাভাবিক মাত্রা হলো প্রথম ২ দিন জাগ্রত অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে ১-২ ফোঁটা করে প্রতি ২ ঘন্টা পর পর কনজাংটিভার থলিতে প্রয়োগ করতে হবে এবং পরবর্তী ৫ দিন জাগ্রত অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে ১-২ ফোঁটা করে প্রতি ৪ ঘন্টা পর পর প্রয়োগ করতে হবে।

কানে প্রয়োগ
প্রথমাবস্থায় সকল ব্যাকটেরিয়া জনিত কানের ক্ষত চিকিৎসায় ২-৩ ড্রপস্ ওষুধ দিনে ২-৩ ঘন্টা পর পর আক্রান্ত কানে প্রয়োগ করতে হবে, সংক্রমণের উন্নতির সাথে সাথে মাত্রা কমাতে হবে। কমপক্ষে ৭ দিন চিকিৎসা চলবে।

প্রতি নির্দেশনা
কুইনোলন জাতীয় ওষুধ অথবা এই ওষুধটিতে ব্যবহৃত যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

সতর্কতা
দীর্ঘদিন যাবৎ চোখে সিপ্রোফ্লক্সাসিন ব্যবহারের ফলে অসংবেদনশীল জীবাণু যেমন ছত্রাকের বৃদ্ধি ঘটতে পারে। চুলকানী বা অন্য যে কোন ধরনের অতিসংবেদনশীল উপসর্গ দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই সিপ্রোফ্লক্সাসিন এর ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে।

সাবধানতা
এই চোখ/কানের ড্রপ চোখে ইঞ্জেকশন প্রয়োগের জন্য নয়। চোখের চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করা অনুচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া
স্থানীয় জ্বালাপোড়া বা অস্বস্থি, চুলকানি, বাহিরের বস্তুর উপস্থিতির অনুভূতি, দানাদার তলানি, চোখের পাতার পাশে ফেঁটে যাওয়া, কনজাংটিভায় রক্ত সঞ্চায়ণ, প্রয়োগের পর বিস্বাদ লাগা। উপরন্তু কর্ণিয়ার দাগ পড়া, এলার্জিক ক্রিয়া, অশ্রু ঝরা, আলোতাঙ্ক এবং বমি বমি ভাবের অভিযোগ পাওয়া যেতে পারে।

ড্রাগ ইন্টার‍্যাকশন
চোখে ও কানে ব্যবহৃত সিপ্রোফ্লক্সাসিন এর নির্দিষ্ট কোন ড্রাগ ইন্টার‍্যাকশন এর কোন অভিযোগ নেই।

গর্ভাবস্থায় ব্যবহার
গর্ভাবস্থায় সিপ্রোফ্লক্সাসিন ব্যবহারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত নয়।

দুগ্ধদানকালে ব্যবহার
মাতৃ দুগ্ধদানকালে চোখে ওষুধটি প্রয়োগ করলে সাবধানতার সহিত ব্যবহার করতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার
এক বছরের নিচে শিশুদের ক্ষেত্রে সিপ্রোফ্লক্সাসিন এর নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অতিরিক্ত মাত্রা
অধিকমাত্রায় বাহ্যিকভাবে ব্যবহৃত আই ড্রপস্ মৃদু গরম পানি দ্বারা সরিয়ে ফেলা যায়।

সংরক্ষণ
৩০° সে. তাপমাত্রার নীচে আলো থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠাণ্ডা স্থানে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। ব্যবহারের পর পরই ড্রপারের মুখ বন্ধ করুন। মুখ খোলার পর ৩০ দিন পর্যন্ত ওষুধটি ব্যবহার করা যাবে।

সরবরাহ
সিপ্রোসিন® চোখ/কানের ড্রপস্: প্রতিটি প্লাস্টিক ড্রপার বোতলে রয়েছে ৫ মি.লি. সিপ্রোফ্লক্সাসিন ০.৩% জীবাণুমুক্ত দ্রবণ।

এস্ট্রাম™
প্যারাসিটামল ৩২৫ মি.গ্রা. এবং ট্রামাডল হাইড্রোক্লোরাইড ৩৭.৫ মি.গ্রা.

উপাদান
এস্ট্রাম™ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে প্যারাসিটামল বি.পি. ৩২৫ মি.গ্রা.এবং ট্রামাডল হাইড্রোক্লোরাইড বি.পি. ৩৭.৫ মি.গ্রা.।

ফার্মাকোলজি
ট্রামাডল একটি সেন্ট্রালি কার্যকরী অপিয়ড অ্যানালজেসিক। ইহার কার্যপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত নয়। প্রাণীদের উপর পরীক্ষায় দুই ধরনের কার্য পদ্ধতি পাওয়া যায়। প্যারেন্ট এবং এম১ মেটাবোলাইটের অপিয়ড রিসেপ্টরের সাথে বন্ধন এবং নরএপিনেফ্রিন ও সেরেটোনিন পুনঃগ্রহণ এর প্রতি দুর্বল প্রতিরোধক ক্ষমতা। প্যারেন্ট যৌগটির দুর্বল বন্ধন শক্তি এবং অর্থো-ডিমিথাইলেটেড মেটাবোলাইট এম১ এর মিউ অপিয়ড রিসেপ্টর এর প্রতি শক্তিশালী বন্ধন উভয় কারনেই অপিয়ড -এর কার্যকারিতা পাওয়া যায়।

অন্যান্য অপিয়ড অ্যানালজেসিক এর মত ট্রামাডল ইনভিট্রো পরীক্ষায় নর-এপিনেফ্রিন এবং সেরেটোনিন এর পুনঃগ্রহণ করার ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করে। এই কার্যপদ্ধতি ট্রামাডল এর সার্বিক কার্যক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।

প্যারাসিটামল একটি নন-অপিয়ড, নন-স্যালিসাইলেট অ্যানালজেসিক।

নির্দেশনা
এস্ট্রাম™ ট্যাবলেট মাঝারী এবং মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথায় প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

এস্ট্রাম™ ট্যাবলেট তীব্র ব্যথার স্বল্প মেয়াদী (৫ দিন অথবা এর কম) চিকিৎসায়ও নির্দেশিত।

মাত্রা এবং সেবনবিধি
এস্ট্রাম™ খাবারের আগে বা পরে যেকোন সময় সেবন করা যেতে পারে।

মাঝারী অথবা মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথায় ১-২টি ট্যাবলেট প্রতি ৪ অথবা ৬ ঘন্টা পর পর এবং দিনে সর্বোচ্চ ৮টি ট্যাবলেট সেবন করা যায়।

তীব্র ব্যথায় স্বল্প মেয়াদী (৫ দিন অথবা এর কম) চিকিৎসায় ২টি ট্যাবলেট প্রতি ৪ অথবা ৬ ঘন্টা পর পর (দিনে সর্বোচ্চ ৮টি ট্যাবলেট) সেবন করা যায়।

প্রতিনির্দেশনা
ট্রামাডল, প্যারাসিটামল অথবা এ ওষুধের অন্য যে কোন উপাদান বা অপিয়ড -এর প্রতি সংবেদনশীল রোগীকে এ ওষুধটি দেয়া উচিত নয়। যে সকল ক্ষেত্রে অপিয়ড প্রতিনির্দেশিত, সেসব ক্ষেত্রে এ ওষুধটিও প্রতিনির্দেশিত।

সতর্কতা
- এটি গাড়ী চালানো অথবা মেশিন পরিচালনার মত জটিল কাজ করতে যে পরিমান মানসিক ও শারীরিক দক্ষতার প্রয়োজন হয় তার ব্যঘাত ঘটাতে পারে।
- এই ওষুধটি অ্যালকোহলযুক্ত কোমল পানীয়ের সাথে সেবন করা উচিত নয়।
- অন্যান্য ট্রামাডল অথবা প্যারাসিটামল যুক্ত ওষুধের সাথে এবং OTC ওষুধের সাথে একত্রে এই ওষুধটি সেবন করা উচিত নয়।
- ট্রানকুলাইজার, হিপনোটিকস অথবা অন্যান্য অপিয়ড অ্যানালজেসিক এর সাথে সেবন করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

শিশু এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে ব্যবহার
শিশুদের ক্ষেত্রে এ ওষুধটির নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনো নিরীক্ষা করা হয়নি।

সাধারণত বয়স্কদের ক্ষেত্রে মাত্রা নির্ধারণে সতর্ক হওয়া উচিত। সমসাময়িক অন্য রোগ এবং এ সকল রোগের বিবিধ চিকিৎসার কারণে যকৃত, কিডনি অথবা হৃদপিন্ডের কার্যকারিতা হঠাৎ করে কমে যাওয়ার সম্ভাবনার উপর পর্যালোচনা করে মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত।

বৃক্ক সংক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার
এস্ট্রাম™ বৃক্কের সমস্যাজনিত রোগীদের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত নয়। যে সকল রোগীদের ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৩০ মি.লি./মিনিট এর কম তাদের ক্ষেত্রে দুটি মাত্রার মধ্যবর্তী সময় বাড়াতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রতি ১২ ঘন্টায় ২টি ট্যাবলেটের বেশি না হয়।

যকৃতের সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে
এস্ট্রাম™ যকৃতের সমস্যাগস্থ রোগীদের উপর নিরীক্ষিত নয়। তাই এর ব্যবহার এ ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া
এস্ট্রাম™ সেবনে নিম্নলিখিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে: এসথেনিয়া, অবসন্নতা, হটফ্লাস, ঝিঁমুনি, মাথাব্যথা, কাঁপুনি, পেটব্যাথা, কোষ্টকাঠিন্য, ডায়রিয়া, পেট ফাঁপা, মুখগহ্বরের শুষ্কতা, বমি, এনোরেক্সিয়া, উৎকন্ঠা, দ্বিধা, ইউফোরিয়া, নির্ঘুমতা, বিচলতা, সোমনোলেন্স, প্রুরাইটাস, র‍্যাশ, অতিরিক্ত ঘাম ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদান কালে ব্যবহার
প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি-সি।

গর্ভবতী মহিলাদের উপর এখনো কোন পর্যাপ্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত তথ্য পাওয়া যায়নি। কেবল ভ্রূনের ক্ষতির ঝুঁকির তুলনায় চিকিৎসায় মায়ের উপকারের পরিমান অতিমাত্রায় বিবেচিত হলে, কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রেই গর্ভাবস্থায় এ ওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু নবজাতক এবং ইনফেন্টদের উপর এ ওষুধটির নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই অবসটেট্রিক্যাল প্রি-অপারেটিভ মেডিকেশন এবং ডেলিভারী পরবর্তী অ্যানালজেসিক হিসেবে নার্সিং মায়েদের ক্ষেত্রে এ ওষুধটি নির্দেশিত নয়।

সংরক্ষণ
আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে, ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। হিমায়িত করবেন না। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ
প্রতি বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাক -এ।

সালটোলিন ইনহেলার
সালবিউটামল ১০০ মাইক্রোগ্রাম/পাফ

উপাদান

প্রতি একক একচুয়েশনে আছে ১০০ মাইক্রোগ্রাম সালবিউটামল।

নির্দেশনা

প্রাপ্ত বয়স্ক এবং শিশু যাদের বয়স ৪ বা তার বেশি রোগীদের ক্ষেত্রে, যাদের রিভারসিবল অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ আছে তাদের শ্বাসনালীর চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে এবং ৪ বছর বা তার বেশি বয়সী রোগীদের ব্যায়ামজনিত শ্বাসনালীর সংকোচন প্রতিরোধে সালবিউটামল এইচ এফ এ ইনহেলার নির্দিষ্ট।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

প্রাপ্ত বয়স্ক এবং শিশু যাদের বয়স ৪ বছর বা তার বেশি তাদের মারাত্মক শ্বাসনালীর সংকোচন এর চিকিৎসায় অথবা এ্যাজমাজনিত উপসর্গ প্রতিরোধে ৪ থেকে ৬ ঘন্টা অন্তর ২টি ইনহেলেশন প্রযোজ্য; কিছু কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতি ৪ ঘন্টায় ১টি ইনহেলেশন যথেষ্ট। বেশি সংখ্যক ইনহেলেশন অথবা বারবার প্রয়োগ সুপারিশকৃত নয়। প্রাপ্ত বয়স্ক বা শিশু যাদের বয়স ৪ বা তার বেশি সেসব রোগীদের ব্যায়ামজনিত শ্বাসনালীর সংকোচনরোধে ব্যায়ামের অন্তত ১৫-৩০ মিনিট পূর্বে ২টি ইনহেলেশন নিতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

অন্যান্য সিমপেথোমাইমেটিক এজেন্টের মত সালবিউটামলেও কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, এনজাইনা, ভার্টিগো, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম স্টিমুলেশন, অনিদ্রা, মাথাব্যথা ও অরোফেরিংস এর শুষ্কতা অথবা জ্বালাপোড়া।

কাঁপুনি, নার্ভাসনেস ও মাথাব্যথা মাত্রা ভেদে হতে পারে। আর্টিকারিয়া এনজিওইডিমা, র‍্যাশ, শ্বাসনালীর সংকোচন এবং অরোফেরিংজিয়াল ইডিমা সালবিউটামল ব্যবহারের পর কদাচিত দেখা যায়।

পূর্ব সতর্কতা

অন্যান্য সিমপেথোমাইমেটিক এমাইনের মত সালবিউটামল হৃদপিন্ডের সমস্যা বিশেষত করোনারী ইনসাফেসিয়েনসি, কার্ডিয়াক এরিথমিয়া, খিঁচুনিজনিত রোগ, হাইপারথাইরয়েডিজম বা ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস ও সিমপেথোমাইমেটিক এমাইনের প্রতি অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখায়। এমন রোগীদের ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন দেখা গেছে এবং আশা করা যায় কিছু রোগীর ক্ষেত্রে যে কোন বিটা-এড্রিনার্জিক ব্রংকোডাইলেটর ব্যবহারের পর এমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদান কালে ব্যবহার

প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি-বি। মানুষের ক্ষেত্রে থেরাপিউটিক মাত্রা ইনহেলেশনের পর সালবিউটামল সালফেট ও এইচএফএ ১৩৪এ খুব কম মাত্রায় প্লাজমা-তে পাওয়া যায়। কিন্তু সালবিউটামল এইচএফএ-এর উপাদান মানুষের দুগ্ধে নিঃসরিত হয় কিনা তা জানা যায়নি।

অনুপযোগিতা

সালবিউটামল অথবা এর উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে সালবিউটামল ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সংরক্ষণ

৩০০ সে. তাপমাত্রার নিচে, সূর্যালোক ও তাপ থেকে দূরে সংরক্ষণ করতে হবে। ক্যানিস্টার খালি হলেও ভাঙ্গা, ফুটা করা বা আগুনে পোড়ানো যাবে না। চোখ থেকে দূরে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

প্রতিটি ইনহেলার ২০০ পাফ প্রদান করে।

ফিলওয়েল™ গোল্ড
মাল্টিভিটামিন এবং মাল্টিমিনারেল

উপাদান

ফিলওয়েল™ গোল্ড : প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে ভিটামিন এ ৫০০০ আই ইউ, ভিটামিন সি ৬০ মি.গ্রা., ভিটামিন ডি ৪০০ আইইউ, ভিটামিন ই ৩০ আইইউ, ভিটামিন কে ২৫ মা.গ্রা., থায়ামিন ১.৫ মি.গ্রা., ভিটামিন বি৬ ২ মি.গ্রা., ফলিক এসিড ৪০০ মা.গ্রা.,বায়োটিন ৩০ মা.গ্রা., প্যানটোথেনিক এসিড ১০ মি.গ্রা., ক্যালসিয়াম ১৬২ মি.গ্রা., আয়রন ১৮ মি.গ্রা. আয়োডিন ১৫০ মা.গ্রা., ম্যাগনেসিয়াম ১০০ মি.গ্রা., জিংক ১৫ মি.গ্রা., পটাশিয়াম ৮০ মি.গ্রা., বোরন ১৫০ মা.গ্রা., নিকেল ৫ মা.গ্রা., সিলিকন ২ মি.গ্রা., টিন ১০ মা.গ্রা., রিবোফ্লাবিন ১.৭ মি.গ্রা., নিয়াসিন ২০ মি.গ্রা., ভিটামিন বি১২ ৬ মা.গ্রা., ফসফরাস ১০৯ মি.গ্রা., সেলেনিয়াম ২০ মা.গ্রা., কপার ২ মি.গ্রা., ম্যাঙ্গানিজ ২ মি.গ্রা., ক্রোমিয়াম ১২০ মা.গ্রা., মলিবডেনাম ৭৫ মা.গ্রা., ক্লোরাইড ৭২ মি.গ্রা., ভ্যানেডিয়াম ১০ মা.গ্রা. এবং লিউটিন ২৫০ মা.গ্রা.।

নির্দেশনা

ফিলওয়েল™ গোল্ড ভিটামিন ও মিনারেল অপ্রতুলতায় (Deficiencies) নির্দেশিত। পুরোপুরি দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা মেটাতে ফিলওয়েল™ গোল্ড বাড়তি ভিটামিন ও মিনারেল চাহিদা মেটাতে সাপ্লিমেন্ট হিসাবে সেবন করা যাবে।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

১টি ট্যাবলেট খাবারের সাথে খেতে হবে। শিশুদের জন্য ফর্মুলা আকারে এটি তৈরী করা হয়নি।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না

এই ওষুধটি এর কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে সেবন করা যাবে না। বহুদিন ধরে উচ্চ মাত্রায় ভিটামিন এ গ্রহণে (বিটা ক্যারোটিন সোর্স ব্যতীত) অস্টিওপরোসিস (হাড় ক্ষয়) এর ঝুঁকি রজঃনিবৃত মহিলাদের (পোস্টমেনোপোজাল ওমেন) ক্ষেত্রে বেড়ে যেতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

সাধারণতঃ এ ওষুধ ভাল সহনীয়। বিটা ক্যারোটিনের কারণে মাঝে মাঝে ডায়রিয়া হতে পারে এবং ত্বকের রং সামান্য হলদেটে হতে পারে।

ভিটামিন এ জনিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সমূহ সেরে যায়। ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ই ডায়রিয়া এবং অন্যান্য গ্যাস্ট্রো ইনটেসটাইনাল সমস্যা তৈরী করতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

অন্য ওষুধের সাথে সেবনে কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করতে হবে।

সংরক্ষণ

আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠাণ্ডা স্থানে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

ফিলওয়েল™ গোল্ড : প্রতি বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

এ্যালাট্রোল®
সেটিরিজিন হাইড্রোক্লোরাইড

উপাদান

এ্যালাট্রোল® ট্যাবলেট	:	প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে ১০ মি.গ্রা. সেটিরিজিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি।
এ্যালাট্রোল® সিরাপ	:	প্রতি চা চামচ (৫ মি.লি.) সিরাপে আছে সেটিরিজিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ৫ মি.গ্রা.।
এ্যালাট্রোল® পেডিয়াট্রিক ড্রপস্	:	প্রতি মি.লি.-এ আছে সেটিরিজিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ২.৫ মি.গ্রা.।

ফার্মাকোলজি

এ্যালাট্রোল® একটি শক্তিশালী H_1 রিসেপ্টর এন্টাগনিস্ট যার কোন গুরুত্বপূর্ণ এন্টিকলিনারজিক এবং এন্টিসেরটনিক প্রতিক্রিয়া নেই। ব্লাড ব্রেইন বেরিয়ার অতিক্রম করে মস্কিষ্কে প্রবেশ করতে পারে না বিধায় সাধারণ কার্যকরী মাত্রায় এটি তন্দ্রাচ্ছন্নতা সৃষ্টি করে না বা রোগীর দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজ কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। এ্যালাট্রোল® হিস্টামিনজনিত এলার্জির প্রারম্ভিক পর্যায়কে প্রতিরোধ করে এবং এলার্জির প্রলম্বিত পর্যায়ের জন্য দায়ী প্রদাহ সৃষ্টিকারী কোষগুলোর অস্বাভাবিক চলাচল ও রাসায়নিক পদার্থগুলোর নিঃসরণ কমিয়ে দেয়। এছাড়া এ্যালাট্রোল® এ্যাজমা রোগীর শ্বাসের সঙ্গে প্রবেশকৃত হিস্টামিন দ্বারা শ্বাসনালীর সংকোচনকে দূর করে। এ্যালাট্রোল® খুব দ্রুত বিশেষায়িত হয়। সেটিরিজিনের প্লাজমা হাফ-লাইফ ৬.৭ থেকে ১০.৯ ঘন্টা।

নির্দেশনা

সিজনাল এলার্জিক রাইনাইটিসঃ আগাছা, ঘাস এবং ফুলের পরাগ থেকে সৃষ্ট এলার্জির উপসর্গ সমূহ দূর করে। হাঁচি, নাক থেকে পানি পড়া, নাকের ও চোখের চুলকানি, চোখে পানি আসা ও চোখ লাল হওয়া উপসমে এ্যালাট্রোল® নির্দেশিত।

পেরেনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটিস : ধুলাবালি, পশুর লোম এবং ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট এলার্জির উপসর্গসমূহ দূর করতে এ্যালাট্রোল® নির্দেশিত। এসব উপসর্গের মধ্যে রয়েছে হাঁচি, নাক থেকে পানি পড়া, নাকের ও চোখের চুলকানি ও চোখ থেকে পানি পড়া।

ক্রণিক ইডিওপ্যাথিক আর্টিকেরিয়া : ইডিওপ্যাথিক আর্টিকেরিয়ার ফলে ত্বকের উপসর্গগুলোকে দূর করতে এ্যালাট্রোল® নির্দেশিত। এটি হাইভস এর প্রাদুর্ভাব, ব্যাপকতা এবং স্থায়িত্বকাল কমিয়ে দেয় এবং তীব্র চুলকানি ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়। এটি এ্যালারজেন এর ফলে সৃষ্ট এ্যাজমাকে দূর করে।

সেবনমাত্রা ও বিধি

এ্যালাট্রোল® খাবারের আগে বা পরে যে কোন অবস্থাতেই খাওয়া যায়। রোগীর প্রয়োজনের উপর এ্যালাট্রোল® গ্রহণের সময়কাল নির্ভরশীল।

৬ বছর বা এর বেশি বয়সের শিশুদের এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে:

এ্যালাট্রোল® ট্যাবলেট : প্রতিদিন ১টি ট্যাবলেট ।

এ্যালাট্রোল® সিরাপ : প্রতিদিন ২ চা চামচ একবার অথবা ১ চা চামচ দুইবার।

যে সব রোগীদের কিডনী সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে (যাদের ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ১১-৩১ মি.লি./মিনিট) যাদের হিমোডায়ালাইসিস করা হয়েছে (যাদের ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৭ মি.লি./মিনিট এর কম) এবং যাদের যকৃতের সমস্যা রয়েছে, তাদের জন্য প্রতিদিন ১/২ ট্যাবলেট অথবা ১ চা চামচ সিরাপ খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে।

২-৬ বছরের বাচ্চাদের :

এ্যালাট্রোল® সিরাপ: প্রতিদিন ১ চা চামচ একবার অথবা ১/২ চা চামচ প্রতিদিন দুই বার।

৬ মাস-২ বছরের নিচে বাচ্চাদের:

এ্যালাট্রোল® সিরাপ: প্রতিদিন ১/২ চা চামচ একবার। ১২-২৩ মাসের শিশুদের জন্য সর্বোচ্চ মাত্রা ১/২ চা চামচ করে প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর দেয়া যেতে পারে।

এ্যালাট্রোল® পেডিয়াট্রিক ড্রপস্: প্রতিদিন ১ মি.লি. করে ১ বার। ১২-২৩ মাসের শিশুদের জন্য সর্বোচ্চ মাত্রা ১ মি.লি. করে প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর দেয়া যেতে পারে।

যাদের কিডনী ও লিভারের সমস্যা রয়েছে:

যাদের মাঝারি ধরণের বা তীব্র কিডনী সমস্যা রয়েছে, যাদের ডায়ালাইসিস করা হচ্ছে এবং যাদের যকৃতের সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে মাত্রা পূণঃনির্ধারণ করা আবশ্যক।

সতর্কতা এবং সাবধানতা

গাড়ী ও ভারী মেশিন চালানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সেটিরিজিন গ্রহণ করার পর অতিরিক্ত অ্যালকোহল বা অন্যান্য সি এন এস ডিপ্রেসেন্ট ওষুধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ এর ফলে ভারসাম্য আরও হারিয়ে যেতে পারে এবং স্নায়ুবিক অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে।

ড্রাগ ইন্টার‍্যাকশন

থিওফাইলিন, এ্যাজিথ্রোমাইসিন, সিউডোএফিড্রিন, কিটোকোনাজল বা এরিথ্রোমাইসিন এর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোন ড্রাগ ইন্টার‍্যাকশন পরিলক্ষিত হয় না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

সেটিরিজিন গ্রহণের ফলে প্লাসিবো এবং অন্যান্য নন সিডেটিং এন্টিহিষ্টামিনের মতই সামান্য পরিমাণ ঘুম ঘুম ভাব পরিলক্ষিত হতে পারে। তবে কিটোটিফেন, ক্লেমাস্টিন, ফেনিরামিন, ক্লোরফেনিরামিন অথবা মেকুইটাজিন-এর চেয়ে সেটিরিজিন খুবই কম পরিমানে তন্দ্রাচ্ছন্নতা সৃষ্টি করে।

প্রতিনির্দেশনা

সেটিরিজিন অথবা এর পূর্ববর্তী যৌগ হাইড্রক্সিজিন এর প্রতি যাদের অতিমাত্রায় সংবেদনশীলতা বা ইডিওসিনক্রেসী রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সেটিরিজিন নির্দেশিত নয়।

গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মহিলাদের ক্ষেত্রে

গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয়তা না থাকলে সেটিরিজিন গ্রহণ করা উচিত নয়। সেটিরিজিন মায়ের দুধের সঙ্গে নিঃসৃত হয়। তাই স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সেটিরিজিন নির্দেশিত নয়।

সংরক্ষণ

সরাসরি আলো থেকে দূরে রাখুন।

৩০°সে. তাপমাত্রার নিচে শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন।

শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

এ্যালাট্রোল® ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ১০ x ১০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাক-এ।

এ্যালাট্রোল® সিরাপ: প্রতিটি বোতলে আছে ৬০ মি.লি. সিরাপ এবং একটি মাত্রা পরিমাপক কাপ।

এ্যালাট্রোল® পেডিয়াট্রিক ড্রপস্: প্রতিটি বোতলে আছে ১৫ মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ এবং একটি মাত্রা পরিমাপক ড্রপার।

টোজেন্ট® ক্রীম
ডাইফেনহাইড্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ২% এবং জিংক এসিটেট ইউএসপি ০.১%

উপাদান

প্রতি গ্রাম টোজেন্ট® ক্রীমে আছে ডাইফেনহাইড্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ২০ মি.গ্রা. এবং জিঙ্ক এসিটেট ইউএসপি ১ মি.গ্রা.।

ফার্মাকোলজি

ডাইফেনহাইড্রামিন হচ্ছে এন্টি-হিস্টামিন যা ত্বকীয় এন্টি এলার্জিক ও ব্যথারোধী হিসেবে কাজ করে এবং হিস্টামিন নিঃসরণ বন্ধ করে। জিংক ত্বক রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করে।

নির্দেশনা

টোজেন্ট® ক্রীম সাময়িকভাবে ব্যথা এবং চুলকানি দূর করা সহ পোকার কামড়, অল্প পোড়া, সূর্যের আলোতে পোড়া, অল্প কাটা, আঁচড়, র‍্যাশ যা আইভি, ওক, সুমাক এর বিষক্রিয়ায় হয়ে থাকে সেগুলোতেও নির্দেশিত।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি

পূর্ণ বয়স্ক এবং দুই বছরের অধিক:

আক্রান্ত স্থানে দিনে ৩ থেকে ৪ বার ব্যবহার করুন। ক্রীম ব্যবহারের আগে ত্বক পরিস্কার, ঠাণ্ডা ও শুষ্ক করে নিতে হবে। ব্যবহারের পূর্বে গরম পানি দিয়ে গোসল করা যাবে না। মৃদুভাবে ব্যবহার করুন যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্রীম অদৃশ্য হয়। সমগ্র ত্বকের উপরিভাগে যেমন হাত ও পায়ের আঙ্গুলের ভাঁজে, নখের নিচে এবং হাত ও পায়ের তালুতে ভালভাবে ব্যবহার করুন।

দুই বছরের নিচের শিশুদের ক্ষেত্রে:

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী মুখমন্ডল, ঘাড়, কান মাথায় ব্যবহার করুন। চোখ, মুখ এবং নিকটবর্তী এলাকায় ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

ব্যবহারের আট (৮) ঘন্টা পর ধুয়ে ফেলুন। কোথাও ৮ ঘন্টার আগে ধুয়ে বা মুছে গেলে পুনরায় ব্যবহার করুন।

প্রতিনির্দেশনা

এর কোন উপাদান বা অন্য পাইরিথ্রোয়েডস যা পাইরিথ্রিনস এর প্রতি এলার্জি থাকলে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

কিছু ক্ষেত্রে কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিসের সাথে মৃদু ইরাইদেমাটাস ভেসিকুলার লিশন এবং প্যাপিউল দেখা যেতে পারে।

সতর্কতা

শুধুমাত্র বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য। দাহ্য, আগুন থেকে দূরে রাখুন। ডাইফেনহাইড্রামিন আছে এমন কোন ওষুধের সাথে ব্যবহার করা যাবে না এমনকি ডাইফেনহাইড্রামিন মুখেও সেবন করা যাবে না। চিকেনপক্স, হামের ক্ষেত্রে ব্যবহারের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ব্যবহারের সময় চোখের সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকুন।

গর্ভকালীন ও দুগ্ধদানকালে ব্যবহার

পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় ব্যবহারের পূর্বে মেডিকেল পরামর্শ জরুরী। ক্ষতিকর টেরাটোজেনিক প্রতিক্রিয়া নাও দেখা যেতে পারে। যদিও দুগ্ধদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত কিন্তু ত্বকীয় ব্যবহারের ফলে দুগ্ধে নিঃসরণের পরিমান সামান্য।

সংরক্ষণ

আলো থেকে দূরে ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। ফ্রিজে রাখবেন না।

সরবরাহ

টোজেন্ট® ক্রীম : প্রতি প্যাক এ আছে ১০ গ্রাম ক্রীম লেমিনেটেড টিউব-এ।

এ্যাজমার লক্ষণ প্রতিরোধে

Montene™ 4 5 & 10 Tablet

Montelukast 4, 5 & 10 mg

এ্যাজমা প্রতিরোধে

প্রতিদিন একটি করে ট্যাবলেট

মাত্রা ও সেবনবিধি: মনটিন™

১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী: ১টি ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।
৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী: ১টি ৫ মি.গ্রা. চুষে খাওয়ার ট্যাবলেট ।
২ থেকে ৫ বছর বয়সী: ১টি ৪ মি.গ্রা. চুষে খাওয়ার ট্যাবলেট ।

Livwel®

100 ml & 200 ml

Multivitamin & Multimineral A to Z

সকল বয়সের রোগীদের ভিটামিন ও মিনারেলের ঘাটতি পূরণ করে

মাত্রা:

প্রাপ্ত বয়স্ক: প্রতিদিন ৩-৪ চা চামচ
৪-১২ বছরের শিশুদের: প্রতিদিন ২-৩ চা চামচ
১-৪ বছরের শিশুদের: প্রতিদিন ১-২ চা চামচ
নবজাতক-১ বছরের শিশুদের: প্রতিদিন ১ চা চামচ

Rutix®

200 mg &
400 mg tablet

Ofloxacin

Effective short-course treatment options in typhoid fever

- টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসায় প্রথম পছন্দ
- মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট নিউমোনিয়ায় অত্যন্ত কার্যকরী
- টাইফয়েড জ্বরে স্বল্পকালীন ব্যবহারই যথেষ্ট ও কার্যকরী

মাত্রা:

রুটিক্স® ২০০-৪০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার ৫-১০ দিন পর্যন্ত (রোগের অবস্থা ও তীব্রতাভেদে)

SQUARE
PHARMACEUTICALS LTD.
BANGLADESH

AWARDED Superbrands BANGLADESH

www.squarepharma.com.bd

SQUARE

স্বাস্থ্য এবং ওষুধ বিষয়ক সাময়িকী স্কয়ার ১৪তম বর্ষ, ২০১২

মেডিকেল সার্ভিসেস বিভাগ, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, কর্পোরেট হেড কোয়ার্টার্স: স্কয়ার সেন্টার
৪৮, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২, ফোন : ৮৮৩৩০৪৭-৫৬, ৮৮৫৯০০৭ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮২ ৮৬০৮, ৮৮২ ৮৬০৯
E-mail : info@squaregroup.com, Web : http://www.squarepharma.com.bd

Production Swarup Art